সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলি পুরাণাশ্রিত ও মূলত দেব-দেবীদের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত। তবে বিশিষ্ট কবিগণের হাতে কাব্যগুলিতে উঠে এসেছে মানুষের দীর্ঘ জীবনচর্যা আর মানুষের এই জীবনচর্যাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবিগণ ব্যবহার করেছেন নানা বস্তুতান্ত্রিক উপচার। যেগুলির সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পৃক্ত পরিবেশ। পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি আমাদের চারদিকে ঘিরে থাকা ঘর-বাড়ি, জল, মাটি, বায়ু, মানুষজন, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ এসবকে। কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞানের মতে পরিবেশ হল সজীব (Biotic) কিংবা নির্জীব (Abiotic) উপাদান, যা মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে থেকে মানুষের বেঁচে থাকাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র খাদ্য-খাদকের নয়, সম্পর্কটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বা পারস্পরিক আদান-প্রদানের। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে। তাই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে (বায়ু, মাটি, জল, বৃক্ষ ইত্যাদি) দেব-দেবী রূপে পুজো করবার মধ্যে আসলে তাদের পরিবেশ ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক বিশ্বে মানুষের ভাবনা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে সমীকরণ অনেকটাই বদলে দিয়েছে। গাছ, মাটি, পাথরের মধ্যে ঈশ্বর খুঁজে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্মতা অনুভব করতো, তা বর্তমানে লুপ্ত। তাই যে পরিবেশ ছিল মানুষের অবাধ বিচরণক্ষেত্র তা আজ বিপন্ন। বিপন্নতার মুখে নানান বন্যপ্রাণি, উদ্ভিদ ছাড়াও নানান সজীব উপাদান। তাই তৈরি করতে হয়েছে পরিবেশ নীতি (Environmental Ethics)। আইন করা হয়েছে পরিবেশকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। বর্তমান জাতীয় পরিবেশ নীতিও (২০০৪) পরিবেশের সমস্যাকে একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসাবে না দেখে, সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য অর্থনৈতিক-সামাজিক রীতির ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের সংরক্ষণের কথা বলেছেন। তবুও অরণ্য নিধনের মতো সংবাদ প্রায়শই শোনা যায়। পরিবেশ নীতি কঠোরভাবে মেনে চলে আমাদের ভবিষ্যতকে কণ্টকমুক্ত করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। মানুষের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতেই পৃথিবী নামক বৃহৎ ইকোসিস্টেমটির (Ecosystem) উপাদানগুলির তারতম্য না ঘটিয়ে যথাযথ সামঞ্জস্য ধরে রাখার প্রয়াস নিতে হবে। ইকোসিস্টেম টিকে থাকে পারস্পরিক মিথোজীবিতার (Symbiosis) মধ্যে। তাই একটি উপাদান বা প্রজাতি বিপন্ন হলে তার প্রভাব পুরো সিস্টেমটির ওপরই আসে।

পরিবেশবাদী পাঠ (Ecocriticism) বিশ শতকের শেষার্ধের বহুল চর্চিত একটি সাহিত্যিক বিষয়। নয়ের দশকে সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। বাংলায় এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কোনো কাজ হয়নি। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভিদদের নিয়ে বিশ্বজিৎ কর্মকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর গ্রন্থটির নাম 'বাংলা সাহিত্যে উদ্ভিদ'। এছাড়াও 'প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা' বিষয়ে শুভেন্দু গুপ্ত একটি গ্রন্থ লিখেছেন। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নীতির উপর একটি গ্রন্থ লিখেছেন করুণাসিন্ধু দাশ, তাঁর গ্রন্থটির নাম 'প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নীতি : সংস্কৃত শাস্ত্র, সাহিত্য দর্পণে'। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের রচনায় পরিবেশবাদ কীভাবে উঠে এসেছে সেগুলি নিয়েও বেশ কিছু কাজ হয়েছে। যেমন, দেবলীনা মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ : পরিবেশভাবনা ও প্রয়োগে', অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা', কবিতা চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা' ইত্যাদি।

পরিবেশবাদ আধুনিক চিন্তা-ভাবনার ফসল। সৃষ্টির লগ্ন থেকেই মানুষ প্রতিকূল পরিবেশকে হার মানিয়ে জয়ী হতে চেয়েছে তবুও পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যপাঠে আমরা বুঝতে পারি। পরিবেশবাদ তত্ত্বটি আধুনিক কিন্তু পরিবেশ ভাবনার বীজটি মানুষ আবহমানকাল ধরেই অসচেতনভাবে বহন করে আসছে তাদের নানান সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে না হলেও অসচেতনভাবে পরিবেশ চিন্তা লক্ষ করা যায়।

'পরিবেশ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল— পরি-√ বিশ্ /√ বিষ্ + অ, অর্থাৎ যার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে যে কোনো জীবের সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য তার চারপাশে যে জৈব-রাসায়নিক প্রতিবেশ প্রয়োজন, সেটাই হল পরিবেশ। অর্থাৎ যা জীবের অস্তিত্বকে পরিবেষ্টন করে থাকে সেটিকে 'পরিবেশ' বলে। পরিবেশবাদ বা পরিবেশবিদ্যাবাদ (Environmentalism) পরিবেশ ও জীবজগতের সম্পর্ককে অনুশীলন করে। আর পরিবেশবাদী পাঠ বা ইকোক্রিটিসিজম হল পরিবেশ ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্কের পাঠ। Ecocriticism শব্দটি উইলিয়াম রুয়েকার্ট তাঁর 'Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism' (১৯৭৮) প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। অবশ্য পরিবেশ

সচেতনামূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'Consultative Commission for the International Protection of Nature' বা 'প্রকৃতির আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শমূলক কমিশন' এর মধ্যে দিয়ে। এরপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠা United Nations Organization (UNO) বা রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশবাদী আলোচনা করতে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাচেল কার্সন তাঁর 'Silent Spring' গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশের যে সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব পরিবেশ ভাবনার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে যা স্টকহোম সম্মেলন নামে পরিচিত। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও ডি-জেনিরো (Rio De-Janeiro) শহরে অনুষ্ঠিত হয় বসুন্ধরা মহাসম্মেলন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন। এরই মাঝে চেরিল গ্লোটফেল্টি পরিবেশবাদী আন্দোলনকে সাহিত্যিক তত্ত্বের আকার দেন। চেরিল গ্লোটফেল্টি এবং হ্যারল্ড ফ্রম সম্পাদিত 'The Ecocriticism Reader : Landmark in literary ecology' (১৯৯৬) গ্রন্থটির মধ্যে প্রথম পরিবেশবাদী পাঠের তাত্ত্বিক রূপটি দেখতে পাই। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, পরিবেশবাদী পাঠ তত্ত্বের চর্চাকারীরা মিলিতভাবে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলেন যার নাম 'The Association for the Study of Literature and Environment' (ASLE)। ১৯৯৩-এ এঁদের হাত ধরেই দেখা দিল ISLE অর্থাৎ 'Interdisciplinary Studies in Literature and Environment'। এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পরিবেশবাদী পাঠচর্চার ধারা বিকশিত হয়ে খুব দ্রুত সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বব্যাপী আলোচিত হতে থাকে।

পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাভাবনা সাম্প্রতিককালের হলেও পরিবেশ সচেতনতার বীজটি কিন্তু আমরা আমাদের প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাই। ঋগ্বেদে জল সংরক্ষণ, সামবেদে জীবন ও বাস্তুতন্ত্রে জলের ভূমিকা, যজুর্বেদে ভূমির পরিচর্যা ও সংরক্ষণ, ওষধি বৃক্ষরোপণ ও বিচিত্র জীবজন্তুর উল্লেখ দেখি। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মনুসংহিতা', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ইত্যাদি গ্রন্থাদিতেও পরিবেশ প্রসঙ্গ পাই। পরবর্তীকালে কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রমুখ কবিদের বিভিন্ন রচনার প্রকৃতি চিত্রের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির নানা উপাদানের অর্চনা করে এসেছে। বিভিন্ন লৌকিক আচারের মধ্যে আজও তা বর্তমান। এইসব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের অবচেতন মনের পরিবেশ ভাবনা বিরাজ করছে। নবান্নে কাকরূপী পিতৃগণকে ভোজ্য উপহার, কালীপুজোয় শিবাভোগ এছাড়া গরু, ষাঁড়, সিংহ, বাঘ, হাতি, শেয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইত্যাদি প্রাণিকে বিভিন্ন দেবতার বাহন রূপে পুজো করার মধ্যে তাদের সংরক্ষণের বার্তাই পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে সকালে খুদ ছড়ানো, বিজয়াদশমী থেকে সরস্বতী পুজো পর্যন্ত ইলিশ মাছ না খাওয়া, জ্যৈষ্ঠমাসের মঙ্গলবার বা জয়মঙ্গলবারে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন লোকসংস্কার আসলে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই। এভাবেই বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন দেবতার প্রতীক (যেমন, নারায়ণের তুলসী, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বট-অশ্বত্থ, শিবের বেল, আকন্দ, ধুতুরা, মনসার সিজ, শীতলার নিম, লক্ষ্মীর ধান ও কলাগাছ, হরির আমলকী, ত্রিদেবের পলাশ) রূপে সংরক্ষিত। বিভিন্ন লোকখেলার মধ্যেও পরিবেশ ভাবনার সুপ্ত অবস্থান লক্ষ করা যায়। যেমন, গাছছুয়া, আমের ঝুল ইত্যাদি। লোকসংস্কারেও পরিবেশ ভাবনা দেখি। দোলপূর্ণিমার আগের দিন বুড়ির ঘর পোড়ানো, রাজবংশী সমাজে প্রচলিত কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনের লখীডাক, গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন গোয়ালঘরের সামনে প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি নানা আচারে পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক পরিবেশ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক। নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থাননাম, নদ-নদীর নাম সাহিত্যে উঠে আসে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, বেহুলার গাঙুরের জলে ভাসান-যাত্রা, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ধনপতির গৌড়যাত্রা এবং সিংহলযাত্রা, 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের যুদ্ধযাত্রা, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবৎ' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রা, বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের তীর্থযাত্রা, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ভবানন্দের কাশী গমন ও প্রত্যাগমন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে ভৌগোলিক স্থাননাম তথা নদ-নদী, অরণ্য অঞ্চল, পুষ্করিণীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

সাহিত্য মানুষের কথা বলে এবং মানুষ প্রাকৃতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গাছপালা। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই গাছপালার উপর নির্ভরশীল, ফলে তার পরিচর্যাতেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকর্ম লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কাব্যকারগণ তাঁদের

কাব্যে উদ্ভিদ জগতের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর নগর পত্তনের উদ্দেশ্যে নানাবিধ বৃক্ষচ্ছেদন (নির্বাচিত) করতে যেমন দেখি তেমনই কলিঙ্গ নগরে দেবীর দেউল নির্মাণ প্রসঙ্গে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ সৃজন করতেও দেখি। বণিক-খণ্ডে দুবলার শাক তোলা প্রসঙ্গে নানাবিধ উদ্ভিদের উল্লেখ পাই। দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে, রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যে পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন বৃক্ষের কথা উঠে এসেছে। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বনসৃজন প্রসঙ্গ পাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করতে দেখি।

পরিবেশের সজীব উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রাণি। এই প্রাণিজগতের প্রসঙ্গ নানাভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে উঠে এসেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর মৃগয়া প্রসঙ্গ ছাড়াও পশুদের গোহারি অংশে বিস্তর বন্যপ্রাণির বিবরণ পাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণের সময় যে সরোবর খনন ও উদ্দ্যান নির্মাণ করা হয় সেখানে প্রচুর জলচর পাখি, মাছ, সাধারণ পাখি, কীটপতঙ্গ, বন্যজীব, সাপের বর্ণনা পাই। মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পশুসৃজন অংশে জীবজন্তুর বিবরণ পাই। বন্য জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশবাদী পাঠের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

'বাস্তু' শব্দটি এসেছে 'বস্তু' থেকে, বস্তু বলতে মূলত জাগতিক সবকিছুকেই বোঝায়। বাস্তু সংক্রান্ত 'ইকোলজি' (Ecology) শব্দটি আর্নেস্ট হেকেল সর্বপ্রথম ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্যবহার করেন। 'Oikos' (বাড়ি বা গৃহ বা বাসস্থান) 'Logos' (জ্ঞান) অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে ইকোলজি শব্দটির অর্থ হল বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞান বা অধ্যয়ন। আবার সামগ্রিক অর্থে জীবাণু, উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলির মধ্যে যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় ক্রিয়া চলছে সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করাকে বাস্তুসংস্থান বা বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি বলে। একদিক থেকে বাস্তু বা গৃহনির্মাণ কৌশলও এর অন্তর্গত। কথায় আছে 'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া'। অর্থাৎ পূর্বদিকে হাঁসপালন মানে পুকুর চাই; পশ্চিমে বাঁশ যা পশ্চিমাবায়ু থেকে রক্ষা করবে। উত্তর দিকের সুপারি গাছ শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচাবে এবং দক্ষিণদিক থাকবে ফাঁকা, কারণ দক্ষিণের বাতাস স্বাস্থ্যকর।

ইকোসিস্টেম (Ecosystem) বা বাস্তুতন্ত্র হল ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যার মৌলিক কার্যকরী একক। কোনো জীব সে উদ্ভিদ বা প্রাণি কেউই একা এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে না। এরা প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। উৎপাদকের উৎপাদিত খাদ্য, খাদক গ্রহণ করে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এইভাবে তৈরি হয় খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain), আবার কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয় একটি খাদ্যজাল (Food Web)। নাথ সাহিত্যে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রসঙ্গ দেখতে পাই। 'চণ্ডীমঙ্গল' (কবিকঙ্কণ মুকুন্দ) কাব্যে দেবীর দেউল নির্মাণ কিংবা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির নির্মাণের সময় যেভাবে গাছপালা, জলচর-স্থলচর পশুপাখি, জীবজন্তুর প্রসঙ্গ এনেছেন তা অবশ্যই সেযুগের বাস্তুতন্ত্রের চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। বাস্তুতন্ত্র (Ecosyatem) হল বাস্তুবিদ্যার (Ecology) এক প্রধান বিষয় যার মধ্যে সজীব (Biotic) এবং অজীবিয় (Abiotic) উপাদানগুলির মধ্যে চক্রাকারে পুষ্টি ও শক্তির প্রবাহ হয়। এইভাবে আমরা সমগ্র পৃথিবীকে একটি দৈত্যাকার ইকোসিস্টেম ভাবতে পারি।

নীতি কথাটির অর্থ সুনিয়ম বা সুবিধি। পরিবেশ সকল জীবের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার আধার। তাই পরিবেশ যাতে বিনষ্ট না হয়, তার জন্য বিধান বা নীতি থাকা উচিত। সভ্যতার উদয় পর্বে মানুষ সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় রীতি ও প্রথার সাহায্যে পরিবেশকে রক্ষা করার নিয়ম পালন করতো। বনদেবতার পুজো, আগুনকে দেবতারূপে আহ্বান করা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আদি সমাজকর্তাদের পরিবেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সময় যত এগিয়েছে, মানুষ উন্নত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভোগবাদ প্রাচীন রীতিনীতিগুলিকে ধ্বংস করেছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে এবং তার কুফলও ধরা পড়েছে। তাই মানুষ নিজের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও শুরু করেছে। তারই ফলশ্রুতি আধুনিক পরিবেশ নীতি। মধ্যযুগে এইরকম কোনো আইন ছিল না ঠিকই কিন্তু তাদের বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবেশ সচেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে।